ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 200-209
www.athenajournalcbm.in

আদি মধ্যকালীন বাংলার লেখ-সাক্ষ্যে হাটের উপস্থিতি: বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকীকরণ

অতীন চক্রবর্ত্তী* ও অনির্বাণ হাজরা**

প্রাপ্ত: ১৮.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ২৫.০৪.২০২৪ গৃহীত: ০৯.০৫.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান লেনদেনের কেন্দ্র হল হাট। আদি মধ্যকালীন বাংলার বিভিন্ন রাজশক্তি কর্তৃক ভূমিদানের উদ্দেশ্যে জারিকৃত তাম্রশাসনে অনেক সময় হট্ট, হট্টিকা, হাটক প্রভৃতি শব্দগুলি লক্ষ্য করা যায়। উক্ত শব্দগুলি বর্তমান হাটের সমার্থক। তাম্রশাসনে দেখা যায় হাটগুলি উল্লিখিত হয়েছে দানকৃত জমির সীমা বর্ণনার সময় অথবা দানকৃত ভূমির মধ্যেই। হাটের নামগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে হাটের অবস্থান, মালিকানা এবং আয়তনও স্পষ্ট হয়। হাট দানের সময় অনেক ক্ষেত্রেই হাটের সহিত ঘাট দানের প্রসঙ্গও পরিলক্ষিত হয়। নৌঘাটের নিকট হাটের সহাবস্থান একই সাথে ওই হাটে আনীত পণ্যের বিক্রয়ের সম্ভবনাকে নির্দেশ করে। তা ছাড়া তাম্রশাসনে হাটের সঙ্গে বিভিন্ন বৃক্ষজাত পণ্য, যেমন: আম, নারিকেল, পান, সুপারি প্রভৃতির উল্লেখ থেকে হাটে ক্রীত-বিক্রীত সামগ্রীর ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া কতিপয় বণিক শ্রেণীর পরিবর্তিত চরিত্র হাটের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত সাযুজ্যপূর্ণ। আলোচ্য সময়ে কতিপয় বণিকেরা পরিণত হয়েছিল ধনী ভূপতি এবং গ্রামীণ বণিকে। ভূসম্পত্তি লাভ হেতু এই বণিকেরা প্রশাসনিক বিভিন্ন পদ আরোহণ করেন মূলত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধা, মর্যাদা বৃদ্ধি এবং স্থায়ী উপার্জনের নিশ্চয়তার জন্য। উক্ত শ্রেণীর পোষকতায় বিভিন্ন বাগানজাত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের জন্য বৃদ্ধি পায় হাটের সংখ্যাও। সুতরাং আদি মধ্যকালীন তাম্রশাসনগুলি অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হাটগুলির ভূমিকা, হাটে ক্রীত-বিক্রীত পণ্য ও হাটের চরিত্র বিশ্লেষণ করাই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্বিষ্ঠ।*

সুচক শব্দ: *অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, বিক্রয়, গ্রামীণ, তাম্রশাসন, ভূপতি, হাট।*

---

*এম.এ. শিক্ষার্থী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: atin2622@gmail.com
**এম.এ. শিক্ষার্থী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: anirbanhazra3154@gmail.com

ভূমিকা

ভারত ইতিহাসের যে পর্বগুলি ঐতিহাসিকমহলে উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল আদি মধ্যযুগ, যার কালগত ব্যাপ্তি খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক। এই ছয় শতাব্দী ব্যাপি কালপর্বে তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করে ভূ-সম্পদ দানের দলিল বহুল পরিমাণে জারি করা হয়েছিল, আর এই উপাদানের ওপর ভর করেই বিভিন্ন মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকগণ কার্যত প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে আদি মধ্যকালে সমগ্র উপমহাদেশের অর্থনীতি হয়ে পড়েছিল গ্রাম নির্ভর। গ্রামগুলিও ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের মধ্যে চলত না কোনও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ।[১] এইভাবে উক্ত ইতিহাসবিদেরা উপমহাদেশীয় অর্থনীতিকে সামন্ততান্ত্রিক লক্ষণাক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার নিদর্শন দেখেছিলেন যে তিনটি স্থানে তার মধ্যে একটি হল পাল-সেন শাসনাধীন বাংলা ভূখণ্ড।[২] বাণিজ্যিক অধোগতি ও নিরক্ত অর্থনীতির বিপরীতে যে সকল ইতিহাসবিদ আদি মধ্যকালীন জঙ্গম অর্থনীতির চিত্রটি পেশ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, রণবীর চক্রবর্তী প্রমুখ ঐতিহাসিক, যারা তাঁদের তন্নিষ্ঠ গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন আদি মধ্যকালীন গ্রামগুলি কখনওই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন ছিল না বরং তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে আদান-প্রদান চলত।[৩] উক্ত ধারণার প্রধান সাক্ষ্য হয়ে ওঠে তাম্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামের সীমানা ও জমির ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসঙ্গগুলি। তবে তাম্রশাসনগুলিতে কেবল এই সংক্রান্ত তথ্যই থাকে না, এর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক চিত্তাকর্ষক তথ্যও নিষ্কাষণ করা সম্ভব। যেমন, বিভিন্ন লেখমালায় উল্লিখিত *হট্ট, হট্টিকা, হাটক* প্রভৃতি শব্দগুলি আমাদের গোচরে আসে। *হট্ট* অর্থে অবশ্যই গ্রামীণ লেনদেনের কেন্দ্র হাটকে বোঝানো হয়েছে, যেটির প্রায় সমার্থক *হট্টিকা,* সম্ভবত *হট্ট*-এর তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন।[৪] ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, "হাটে লেনদেনের পরিসর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও গ্রামীণ জীবন ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে হাটের ভূমিকা তর্কাতীত"।[৫]

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে একটি বিষয় স্মর্তব্য। সমীক্ষাধীন কালপর্বে বাংলা কোনও একীকৃত অঞ্চল ছিল না, তা ছিল পাঁচটি উপাঞ্চলের সমষ্টি। উপাঞ্চলগুলির আপন আপন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকট। উক্ত এই উপাঞ্চল পাঁচটি হল: পুণ্ড্রবর্ধন (অভিবক্ত বাংলার উত্তরাঞ্চল), রাঢ় (ভাগীরথীর পশ্চিমভাগ, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মূল ভূখণ্ড), বঙ্গ (বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুর-ফরিদপুর ও সন্নিহিত অঞ্চল), সমতট (বাংলাদেশের নোয়াখালি-কুমিল্লা) এবং হরিকেল (বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত ভূখণ্ড)।[৬]

লেখ-সাক্ষ্যে হাটের উপস্থিতি ও তার প্রাসঙ্গিকীকরণ

আদি বাংলার লেখমালায় প্রথম হট্ট শব্দটি পাওয়া যায় কুমারগুপ্তের শাসনকালে ৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত দামোদরপুর তাম্রশাসনে। তবে এখানে হাটের প্রসঙ্গটি কিছুটা বিতর্কিত। তাম্রশাসনে রয়েছে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তর্গত *ঐরাবত-গোরাজ্য* গ্রামের পশ্চিমে পাঁচ দ্রোণ জমির সহিত হাট ও জলাশয় দানের প্রসঙ্গ *(হট্ট-পানক শ্ব সহিতেতি দত্তাঃ)*।[৭] কিন্তু ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, এটি ভূমিতে জলসেচনের জন্য খাল খননের অধিকার। তবে রমারঞ্জন মুখার্জি ও শচীন্দ্র কুমার মাইতি-র মতে এখানে হাট দানের প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয়েছে।[৮]

তারপর এক দীর্ঘ নীরবতা পেরিয়ে আবার খ্রিস্টীয় নবম শতকের খালিমপুর তাম্রশাসনে হাটের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। তাম্রশাসন অনুযায়ী, পালরাজা ধর্মপাল পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির শুভস্থলীতে *নন্ন-নারায়ণ* নামক একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করান এবং মন্দিরের পরিচালনার জন্য *হট্টিকা* ও *তলপাটক* সহ চারটি গ্রাম দান করেন। আদি মধ্যযুগে হাট দানের এটিই প্রথম নিশ্চিত নিদর্শন। এছাড়াও এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রতিটি *আপণ (প্রত্যাপণ)* বা দোকানে পণ্যের ওজন মাপক *(মানপৈঃ)* রাজা ধর্মপালের মহিমাকীর্তন করে থাকেন।[৯] ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তীর অনুমান এই *আপণ* সম্ভবত হাটের থেকে পৃথক ছিল।[১০] তাই সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে এগুলি নগর সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত দোকান বিশেষ।

খ্রিস্টীয় নবম শতকে পালরাজা দেবপালের আমলে নালন্দা ব্রোঞ্জ মূর্তিলেখতে *দেবপালদেব-হট্ট*-এর উল্লেখ রয়েছে, যেটি সম্ভবত নালন্দার নিকটে অবস্থিত ছিল।[১১] রণবীর চক্রবর্তীর মতে, এটি কোনও সাধারণ হাট ছিল না, রাজা দেবপালের নাম থাকায় এটি আয়তনে ও গুরুত্বে সাধারণ হাটের তুলনায় অধিক বৃহৎ ছিল।[১২] তবে, আদি মধ্যযুগীয় লেখমালায় প্রাপ্ত এটি একমাত্র হাট যার সহিত কোনও শাসকের নাম যুক্ত রয়েছে, তাই এমনটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে হাটের কর্তৃত্ব ছিল দেবপালের নিজস্ব মালিকানাধীন।

মহেন্দ্রপালের রাজত্বে জারিকৃত ব্রিটিশ মিউজিয়াম শিলালেখতে (খ্রিঃ নবম শতক) *অজহট্ট (অজা-হট্ট)* নামক হাটের উল্লেখ রয়েছে। *অজ* শব্দের অর্থ ছাগলসহ গৃহপালিত পশু, এবং *হট্ট* অবশ্যই স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্র, অর্থাৎ গৃহপালিত পশু কেনাবেচার জন্য বিশেষ হাট। তবে এই হাটে কেবলই গবাদি পশুর ক্রয়-বিক্রয় হয় এমন ভাবনার কোনও কারণ নেই। শিলালেখতে হাটের সহিত যুক্ত বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের উল্লেখ রয়েছে, যথা: মৎস্যজীবী *(কৈবর্ত)*, শুঁড়ি *(শৌন্ড)*, মালাকার *(মালা-কৃতাং)* এবং চর্মকার *(চর্ম্ম-কৃতাং)*।[১৩] শিলালেখ থেকে আরও জানা যায় যে এই হাটে প্রতিটি মাছের দোকান পিছু একটি করে কড়ি *(বর্তিক)* কর স্বরূপ ধার্য করা ছিল।[১৪]

নালন্দা থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় নবম শতকে শুরপালের রাজত্বকালের একটি অবলোকিতেশ্বরের প্রস্তর মূর্তিতে খোদিত লেখতে *তল-হট্ট* শব্দটি পাওয়া যায়। মূর্তিলেখ অনুযায়ী এই হাটটিও নালন্দার সন্নিকটে অবস্থিত, এবং মূর্তিটি গৌদূবা কুট্ট-র স্ত্রী কালশুকা কর্তৃক উক্ত হাটেই দান করা হয়েছিল।[১৫] এর থেকে অনুমেয় যে এই হাটে অন্যান্য পণ্যের সহিত তক্ষণ শিল্পের নিদর্শনও বিক্রয় হত।

হাটের চরিত্র বিশ্লেষণে জরুরি হয়ে পড়ে হাটের আয়তন বিচারও। হাটের আয়তন কেমন ছিল তার প্রমাণ নিয়ে হাজির খ্রিস্টীয় দশম শতকে পালরাজা রাজ্যপালের সময়ে উৎকীর্ণ ভাতুরিয়া শিলালেখ। লেখটির দ্বিতীয় শ্লোকে এক দাস পরিবারের কথা আছে। এই পরিবারের আদি বাসস্থান হিসাবে *অত্তমূল* নামক এক স্থানের কথা বলা হয়েছে। এই স্থানটি আবার *বৃহদহট্ট*-এর অংশ *(বৃহদহট্ট-বিনির্গত)*। *বৃহদহট্ট* শব্দটির মধ্যেই যুক্ত আছে হাটটির বৃহৎ আয়তনের প্রসঙ্গ, *অত্তমূল* নামক গ্রামীণ জনপদটি সম্ভবত এই হাটেরই লাগোয়া ছিল।[১৬]

হাটের সহিত ঘাট দানের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় দশম শতকে জারিকৃত কম্বোজরাজা নয়পালের ইর্দা তাম্রশাসনে। এখানে দেখা যাচ্ছে রাজা দণ্ড-ভুক্তিতে (রাঢ় উপাঞ্চল) *বৃহৎ-ছত্তিবন্নাগ্রাম*-এ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অশ্বত্থশর্মণকে ভূমিদান করছেন। ভূমিদানের সময় রাজা দানগ্রহীতাকে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে হাট ও ঘাটের *(স-হট্ট-ঘট্ট)* অধিকারও প্রত্যর্পণ করছেন।[১৭] এক্ষেত্রে হাটটি ঐ ব্রাহ্মণের ব্যক্তিমালিকানাধীন হল, এবং যে ঘাটের প্রসঙ্গ রয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই নৌকার মাধ্যমে পণ্য আনয়নকার্যে ব্যবহৃত হত।

এরপরে খ্রিস্টীয় দশম শতকে প্রথম মহীপাল কর্তৃক জারিকৃত রংপুর তাম্রশাসনে হাটের উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রশাসন অনুযায়ী রাজা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে এক ব্রাহ্মণকে দুটি গ্রাম *(রাজিকাগ্রাম ও কুঞ্জভদ্ধিক)* দান করেছিলেন। সেখানে আম ও মহুয়া বৃক্ষ *(স-আম্র-মধূক)*, জলাশয়ের *(স-জলস্থল)* সহিত হাট এবং ঘাট (সম্ভবত নৌকা ঘাট) দানের কথা বলা হয়েছে *(স-হট্ট-ঘট্ট)*।[১৮]

এছাড়া একাদশ শতকে পালরাজা প্রথম মহীপালের সমকালীন রাজভিটা প্রস্তরলেখতে হাট সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। লেখটিতে একটি নয়, তিনটি হাটের নাম আছে, যথা: *দেশীহট্ট (শ্রী-দেশিহট্ট)*, *জয়হট্ট (শ্রী-জয়হট্ট)* ও *গৌড়হট্ট (শ্রী-গৌড়হট্টীয়)*।[১৯] হাটগুলি যে গ্রামের সন্নিকটেই ছিল তা হাট সন্নিহিত স্থাননামগুলির সঙ্গে গ্রাম ও পল্লী শব্দ যুক্ত থাকার মধ্যেই স্পষ্ট *(আবচ্ছুন্নগ্রাম, ধাত্রীপুর, সপ্তখাটক, খনিত্রপল্লী ও লক্ষুন্নগ্রাম)*। ফলে হাটগুলি যে গ্রামীণ লেনদেনে অংশ নিত, এই অনুমানও কষ্টকল্পিত নয়। এছাড়া লেখটিতে *বণিক-গ্রাম (বণিগ-গ্রামেণ)* অর্থাৎ বণিকদের 'গিল্ড' জাতীয় পেশাদারি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তিন বণিকের কথা আছে যারা আবার উক্ত হাটগুলির সাথেও যুক্ত। হাটের নামগুলি বিশ্লেষণ করলে সেগুলির অবস্থান ও মালিকানা নিয়ে সন্দেহ থাকে না।[২০] রণবীর চক্রবর্তীর মতে,

দেশীহট্ট শব্দটির মধ্যে সম্ভবত স্থানীয় বণিকদের কার্যকলাপের ইঙ্গিত রয়েছে।[২১] *জয়হট্ট*-এর অবস্থান স্পষ্ট নয়, তবে এটি যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য নয়। *গৌড়হট্ট* বলতে সম্ভবত বর্তমান মালদহ-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বণিকদের কারবার বোঝানো হয়েছে।[২২] উক্ত লেখটি জানান দেয় বণিক সংগঠনটি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই তিন হাটে ব্যবসায়ীরা নারিকেল ও সুপারি বিক্রয় করে স্বেচ্ছায় বিক্রীত পণ্যদ্বয়ের ওপর এক প্রকার কর প্রদান করবেন। এই কর *সোনাক্কাদেবীমাধব* সংজ্ঞক এক দেবমন্দিরে অর্পিত হবে।[২৩] মনে রাখতে হবে নারিকেল ও সুপারি দুটিই বৃক্ষসঞ্জাত পণ্য। গ্রামীণ পরিসরে এগুলির ব্যাপক চাহিদা ও বিক্রি থাকলে তবেই এগুলির ওপর স্বেচ্ছায় করারোপ করা সম্ভব।

চন্দ্রবংশীয় রাজা লড়হচন্দ্রের ময়নামতি তাম্রশাসন (খ্রিঃ একাদশ শতক) থেকে জানা যায়, লড়হচন্দ্র সমতট মণ্ডলে যে *বপ্পসিংহবোরক* গ্রামটি দান করছেন তার উত্তরে শঙ্কর-ভট্টারক (শিব)-এর মন্দিরের ভোগের জন্য *মহাদেব* নামক গ্রাম অবস্থিত, যেখানে রয়েছে *ধৃতিপুরহট্টিকা*।[২৪] এই *বপ্পসিংহবোরক* গ্রামে সম্ভবত বোরো ধান বপন করা হত, যা থেকেই গ্রামটির এই নামকরণ।[২৫] সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে উৎপাদিত এই ধান পূর্বোক্ত হাটেই বিক্রয় করা হত।

এবার যে তাম্রশাসনটি নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি রাঢ় উপাঞ্চলের *মহামাণ্ডলিক* ঈশ্বরঘোষ (খ্রিঃ একাদশ শতক) কর্তৃক উৎকীর্ণ রামগঞ্জ তাম্রশাসন। উক্ত শাসনে ঈশ্বরঘোষ কর্তৃক এক ব্রাহ্মণ ভট্ট-নিব্বোকশর্মাকে একটি গ্রাম দানের কথা উল্লিখিত। এই শাসনে হাট সংক্রান্ত দুটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, এখানে যে সমস্ত রাজপদাধিকারীর কথা উল্লিখিত তার মধ্যে অন্যতম হলেন *হট্টপতি* অর্থাৎ ইনি হাটের অধীক্ষক। দ্বিতীয়ত, ভূমিদানের সময় দান গ্রহণকারীকে যে হাট ও ঘাটও *(স-হট্ট-ঘট্টঃ)* দান করা হচ্ছে সে কথাও শাসনে বিধৃত।[২৬] এছাড়া যে বিষয়টি এক্ষেত্রে নজরকাড়ে সেটি হল, তাম্রশাসনে পরিষ্কার বলা হয়েছে—যে হাটটি দান করা হল সেটি এতদিন রাজকীয় ভোগে ছিল। হাটটি রাজকীয় মালিকানাধীন ছিল বলেই সম্ভবত রাজাকে *হট্টপতি* নিয়োগের প্রয়োজন পড়েছিল। এছাড়াও হাটের পাশাপাশি আম ও মহুয়া *(সাম্র-মধুকঃ)* গাছও দান করার প্রসঙ্গ এখানে উল্লিখিত হয়েছে।[২৭]

হাট থেকে কর সংগ্রহের এক চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায় ভোজবর্মণের সময়কালে তাঁর *মহাসামন্ত* অবূদেব—মূল আরবি নাম আবু, ইনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন—কর্তৃক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে জারিকৃত সুজানগর শিলালেখতে। লেখটিতে বলা হয়েছে অবূদেবের নিজস্ব ভোগাধিকারে একটি হাট ছিল *(স্বকীয়মহাসামন্তভোগহট্ট)*। *অল্লহভট্টারকস্বামী* বিহারের (আল্লাহর উপাসনালয়) সংস্কারের জন্য অবূদেব এই হাট থেকে আদায়ীকৃত *ক্লিপ্ত* (একপ্রকার শুল্ক) উপাসনালয়ে হস্তান্তরিত করেন।[২৮] রণবীর চক্রবর্তীর অভিমত, ইসলামী উপাসনালয়টির ধারে কাছেই এই বাজার এলাকাটি ছিল। তিনি এই হট্টটিকে গ্রামীণ হাটের সমতুল্য না করে এটির অবস্থান নগর এলাকা বলেই শনাক্ত করেছেন।[২৯] *ক্লিপ্ত* জাতীয় যে শুল্ক আদায় করা হচ্ছে তা বাণিজ্য থেকেই আসত। হাটটি যেহেতু অবূদেবের নিজস্ব মালিকানায় ছিল, তাই আদেশনামা জারির পূর্বে এর থেকে আহৃত শুল্ক নিঃসন্দেহে তাঁর কাছেই যেত।

সেন আমলে একমাত্র লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর (খ্রিঃ দ্বাদশ শতক) তাম্রশাসনেই হাটের প্রসঙ্গ এসেছে। এই শাসন অনুসারে রাজা লক্ষ্মণ সেন উত্তর রাঢ়ের কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত কুমারপুর চতুরক-স্থিত ছয় পাটক পরিমাণ জমি ব্রাহ্মণ কুবেরকে দান করেন। দানকৃত ভূমির মধ্যেই ছিল *রাঘবহট্ট* নামক একটি হাট।[৩০] রাঘব সম্ভবত কোনও ব্যক্তি নামের নির্দেশক। ফলে হাটটি যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। এছাড়া ঐ এলাকাটির উত্তরে ছিল মোরা নদী। দীনেশচন্দ্র সরকার এটিকে বর্তমান ময়ূরাক্ষী নদীর সঙ্গে অভিন্ন বলে শনাক্ত করেছেন।[৩১] নদীপথের নিকটেই হাটের অবস্থান অভ্যন্তরীণ লেনদেনে হাটের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলে।

হট্ট জাতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র উপকূলীয় এলাকাতেও সে বিরাজ করত তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে উৎকীর্ণ ডোম্মনপালের রাক্ষসখালি তাম্রশাসনে। এটি পাওয়া গিয়েছিল সুন্দরবন অঞ্চল থেকে। তাম্রশাসনে একটি স্থান *দ্বারহাটক* বলে আখ্যাত। *হাটক* শব্দটি অবশ্যই হাটের সমার্থক, আর *দ্বার* বলতে সম্ভবত সমুদ্রে পৌঁছাবার মোহনাকে বোঝানো হয়েছে।[৩২] তাই অনুমিত হয়, গঙ্গাসাগর এলাকায় একটি স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্র দ্বাদশ শতকের অন্তিমপর্বে অবস্থান করত।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গোবিন্দ-কেশবদেব কর্তৃক জারিকৃত ভাতেরা তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, কেশবদেব নিজেকে শিবের ভক্ত রূপে দাবি করে বেশ কিছু জমি শৈব মন্দিরে দান করেছিলেন। এই দানকৃত জমির সীমানা নির্দেশে *নবহাটি* ও *হট্টবর* শব্দগুলি উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত *নবহাটি* অর্থে নতুন হাট এবং *হট্টবর* অর্থে বড় বা বৃহৎ হাটকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া *নবহাটি*-তে একটি পাকশালা এবং *ভাটপাড়ায়* আরেকটি পাকশালা-সহ একটি *হট্ট-গৃহ* (হাটের দোকান) দানের প্রসঙ্গও রয়েছে।[৩৩] *হট্ট-গৃহ* থেকে অনুমান করা যায় যে *ভাটপাড়া*-তেও একটি হাটের অবস্থান ছিল। এছাড়াও তাম্রশাসনে দানের সীমানা নির্দেশ হেতু সরমা ও কাহ্যানী নদীর উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে দ্যোত্যে-সহ কিছু নাবিকের গৃহের প্রসঙ্গও *(দ্যোত্যেনবিকাদি-গৃহ)*।[৩৪] উল্লিখিত এই নদীগুলির সাহায্যে সম্ভবত হাটগুলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যুক্ত ছিল, এবং বাণিজ্য এতোটাই সমৃদ্ধতা অর্জন করে যে এই অঞ্চলে একাধিক বণিক বসবাস করতে শুরু করেন। আলোচ্য অঞ্চলটি যেহেতু সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত নয়, তাই এই নাবিকেরা সম্ভবত নদীপথে যাতায়ত করা নাবিক হবেন।

ক্রমিক সংখ্যা	লেখমালার নাম	সময়কাল	দাতা/প্রশাসক	অঞ্চল	উল্লিখিত শব্দ
১	দামোদরপুর তাম্রশাসন	৪৪৮–৪৪৯ খ্রিঃ	কুমারগুপ্ত	পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি	*হট্ট-পানক*
২	খালিমপুর তাম্রশাসন	খ্রিঃ নবম শতক	ধর্মপাল	পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি	*হট্টিকা*
৩	নালন্দা ব্রোঞ্জ মূর্তিলেখ	”	দেবপাল	নালন্দা	*দেবপালদেব-হট্ট*
৪	ব্রিটিশ মিউজিয়াম শিলালেখ	”	মহেন্দ্রপাল	দক্ষিণ বিহার	*অজা-হট্ট*
৫	নালন্দা প্রস্তর মূর্তিলেখ	”	প্রথম শূরপাল	নালন্দা	*তল-হট্ট*
৬	ভাতুরিয়া শিলালেখ	খ্রিঃ দশম শতক	রাজ্যপাল	পুণ্ড্রবর্ধন (?)	*বৃহদ-হট্ট*
৭	ইর্দা তাম্রশাসন	”	নয়পাল	দণ্ড-ভুক্তি	*স-হট্ট-ঘট্ট*
৮	রংপুর তাম্রশাসন	”	প্রথম মহীপাল	পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি	*স-হট্ট-ঘট্ট*
৯	রাজভিটা শিলালেখ	খ্রিঃ একাদশ শতক	প্রথম মহীপাল	গৌড়	*দেশিহট্ট, জয়হট্ট, গৌড়হট্ট, বণিকগ্রাম*
১০	ময়নামতি তাম্রশাসন	”	লড়হচন্দ্র	সমতট-মণ্ডল	*ধৃতিপুরহট্টিকা*
১১	রামগঞ্জ তাম্রশাসন	”	ঈশ্বরঘোষ	রাঢ়	*হট্টপতি, স-হট্টঘট্টঃ*
১২	সুজানগর শিলালেখ	খ্রিঃ দ্বাদশ শতক	ভোজবর্মণ	বঙ্গ	*হট্ট*
১৩	শক্তিপুর তাম্রশাসন	”	লক্ষণ সেন	বর্ধমান-ভুক্তি	*রাঘব-হট্ট*
১৪	রাক্ষসখালি তাম্রশাসন	”	ডোম্মনপাল	বঙ্গ	*দ্বারহাটক*
১৫	ভাতেরা তাম্রশাসন	খ্রিঃ ত্রয়োদশ শতক	গোবিন্দ-কেশবদেব	শ্রীহট্ট-রাজ্য	*হট্টবর, নবহাটি, হট্ট-গৃহ*

পূর্বোক্ত লেখমালাগুলি ছাড়াও আলোচ্য সময়ের হাটের এক তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হল *শ্রীহট্ট*। স্থানের নামটির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে বিচার্য। নামটির সঙ্গে *হট্ট*-এর অনুষঙ্গ স্পষ্ট। *শ্রী* অর্থে যদি সমৃদ্ধিবান বোঝানো হয় তা হলে অনুমান করাই যায় যে এই অঞ্চলে কোনও সমৃদ্ধশালী হাট উপস্থিত ছিল যেখান থেকে এই স্থান নামটির উদ্ভব হয়েছে। তবে চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ান জাং-এর ভারত বিবরণে *শি-লি-চা-টা-লো* নামক স্থানের উল্লেখ রয়েছে।[৩৫] যেটি বর্তমানে সিলেট ও প্রাচীন শ্রীহট্টের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়। উক্ত নামটির মধ্যে *শি-লি* অর্থাৎ শিলার আভাস রয়েছে। হাটটি সম্ভবত পাহাড়ে অবস্থান করায় শিলার প্রসঙ্গ থাকা স্বাভাবিক। এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান লেখ-সাক্ষ্য হল শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন (খ্রিঃ দশম শতাব্দী), যেখানে *শ্রীহট্ট*-কে মন্ডল জাতীয় প্রশাসনিক এককের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৩৬] সম্ভবত *শ্রীহট্ট*-এর সমৃদ্ধশালী হাটের অবস্থান হেতু রাজা শ্রীচন্দ্র নব বিজিত এলাকাটিকে মন্ডল পর্যায়ভুক্ত করে ছিলেন। তাছাড়া শাসনটিতে *শ্রীহট্ট*-এ চারটি নদীর উল্লেখ রয়েছে। একাধিক নদীর অবস্থানের ফলে নদী পথে সুগম্যতা ও নিকটেই এক নৌকা বাঁধার ঘাট *(ইন্দ্রেশ্বর-নৌবন্ধ)*[৩৭] সম্ভবত হাটের সমৃদ্ধতার প্রধান কারণ ছিল।

আলোচ্য লেখমালাগুলির অধিকাংশই পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল এই অঞ্চলের কৃষিকার্জের সমৃদ্ধতা।[৩৮] সন্ধাকর নন্দীর *রামচরিত* (খ্রিঃ একাদশ–দ্বাদশ শতক)-এ পুণ্ড্রবর্ধনের (বরেন্দ্র) এক সমৃদ্ধ কৃষিজমি ও পশ্চাদভূমির উল্লেখ রয়েছে।[৩৯] এছাড়াও একাধিক লেখমালায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন কৃষিজ উপাদানের উল্লেখ ও চাষযোগ্য ভূমিদানের প্রসঙ্গ উক্ত ধারণাকেই পোক্ত করে। সম্ভবত এই সমৃদ্ধ কৃষিজমির ওপর ভিত্তি করেই এই অঞ্চলে একাধিক *হট্ট, হট্টিকা, আপণ* প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এগুলির পাশাপাশি গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্র স্বরূপ *আবারিকা*-এর উপস্থিতিও আমাদের নজরে আসে। পাল-শাসক মদনপাল (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক) কর্তৃক জারিকৃত মনোহোলি তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিস্থিত *আরট্টক* গ্রামে এরূপ কুড়িটি *আবারিকা* দানের প্রসঙ্গ।[৪০] পুণ্ড্রবর্ধনের বাজারের এই সমৃদ্ধতার উল্লেখ পাওয়া যায় *কথাসরিতসাগর* (খ্রিঃ একাদশ শতক) সাহিত্যেও।[৪১]

হাটে ক্রীত-বিক্রীত পণ্যের ধারণা

কেবল হাটের উল্লেখই নয়, হাটে ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্যগুলিরও ধারণা বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। রংপুর ও রামগঞ্জ তাম্রশাসনে আম ও মহুয়া বৃক্ষ দানের প্রসঙ্গ থেকে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবেনা যে এগুলি থেকে আহৃত সম্পদ দানকৃত হাটেই বিক্রীত হত।[৪২] ব্রিটিশ মিউজিয়াম শিলালেখতে উল্লিখিত *অজহট্ট* (ব্যুৎপত্তি অর্থ গৃহপালিত পশু ক্রয়-বিক্রয়ের হাট)-তে গবাদি পশুর পাশাপাশি, মৎস্য, মাদক, মাল্য এবং চর্মজাত দ্রব্যের বিক্রেতাদের প্রসঙ্গও রয়েছে।[৪৩] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ধান, ইক্ষু, সর্ষপ (সর্ষে), আম্র, মহুয়া, লবণ, বাঁশ, কাঠ, পান, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতির পাশাপাশি তক্ষণ শিল্প, অলঙ্কার শিল্প, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্পের দ্রব্যাদিও হাটে ক্রয়-বিক্রয় হত।[৪৪] অর্থাৎ কৃষিজ পণ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী শিল্পের পণ্যাদির লেনদেন যে হত তার অনুমানও অসঙ্গত হবেনা। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য, সমকালীন সাহিত্য ও কিছু লেখমালায় উক্ত শিল্পের দ্রব্যাদি ও শিল্পী গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে সাক্ষী বলা চলে।[৪৫]

ধনী ভূপতি ও গ্রামীণ বণিক, এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সহিত তাদের সম্পর্ক

এখন প্রশ্ন হল, আদি মধ্যযুগীয় লেখমালাগুলিতে হাটের উল্লেখের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? প্রসঙ্গটির এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রয়েছে। অধ্যাপক রিয়োসুকে ফুরুইয়ের মতে, প্রাথমিকভাবে আদি বাংলায় বণিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের গুপ্তকালীন লেখমালায় পাওয়া যায়। তারপরে এক দীর্ঘ নিরবতা পেরিয়ে আবার খ্রিস্টীয় নবম শতকে ধর্মপালের তাম্রশাসনে *সার্থবাহ*-র উল্লেখ রয়েছে।[৪৬] ফুরুইয়ের অনুমান, লেখমালার উল্লেখগুলিতে তাঁদের উপস্থিতির এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যাকে গ্রামীণীকরণের দুটি রূপ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে: ধনী ভূপতি (Landed Magnate) এবং গ্রামীণ বণিক (Rural Marchant) হিসাবে তাঁদের এক নতুন অবস্থান।[৪৭] অর্থাৎ আদি মধ্যযুগের

বণিক সম্প্রদায় গ্রামীণ পরিবেশের সহিত অধিক সম্পৃক্ত হয়ে যায়,[৪৮] এবং তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ভূমির মালিক হিসেবে। এভাবে বণিক শ্রেণী বাণিজ্যে অংশগ্রহণের পাশাপাশি *মহত্তর*-দের ন্যায় ধনী ভূপতির পদমর্যাদা লাভ করে। ভূমিকেন্দ্রিক বণিক গোষ্ঠী হওয়ার দরুন তাঁরা জমিতে বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের ফলনে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর উদাহরণ পাওয়া যায় রাজভিটা শিলালেখতে, যেখানে কতিপয় গ্রামে সুপারি ও নারকেল বাগানের কথা উল্লিখিত, যার ওপর বণিকগোষ্ঠী কর আরোপের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।[৪৯] এই বাগানজাত ফসলগুলি যে পূর্বোক্ত হাটগুলিতেই বিক্রয় করা হত তা নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়।

আলোচিত লেখগুলিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাটের সহিত ঘাট দান এবং দানকৃত জমির সীমানা নির্দেশে হেতু নদীর উল্লেখ রয়েছে। জলপথ নিশ্চিতভাবেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। উক্ত সময়ের বিভিন্ন লেখমালার নিদর্শনে বেশ কয়েকবার নৌকার প্রসঙ্গও এসেছে। এগুলি নিশ্চিতভাবেই পশ্চাদভূমি থেকে পণ্য হাটে আমদানির জন্য ব্যবহৃত হত, এবং নৌকা বাধার জন্য ঘাটেরও প্রয়োজন পড়ত।[৫০]

এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত রয়েছে কড়ি ব্যবহারের প্রসঙ্গও। কড়ি পূর্বভারতে উৎপাদিত হয় না, এটি আমদানি করা হয় মালদ্বীপ থেকে। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে কড়ি আমদানির প্রসঙ্গ খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে আগত ইবন বতুতার বর্ণনায় স্পষ্ট।[৫১] তবে আমদানিকৃত কড়ি কেবল উপকূলীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল অভ্যন্তরীণ গ্রামগুলিতেও।[৫২] মূলত এই ভূপতি বণিকগোষ্ঠীই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে কড়ির ব্যবহারের প্রসারণ ঘটায়, ক্রমে যা আদি মধ্যযুগের বাংলা অঞ্চলের এক শাশ্বত বিনিময়ের মাধ্যম রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে লেখমালায় কড়ির উল্লেখ রয়েছে কর আদায়ের প্রসঙ্গে। রাজভিটা এবং সুজানগর শিলালেখতেও করস্বরূপ কড়ি আদায়ের কথা বলা রয়েছে।[৫৩] এছাড়াও উক্তপর্বের বিভিন্ন তাম্রশাসনে *শৌল্কিক*-এর ন্যায় এক শুল্ক আদায়কারী আধিকারিকের কথা জানা যায়, যিনি সম্ভবত হাট থেকেও শুল্ক আদায় করতেন।[৫৪]

সমাপনী মন্তব্য

আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে কৃষির বিস্তার, অর্থকারী ফসল উৎপাদন এবং কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের প্রতি ঝোঁক থেকে সম্ভবত হাটের সংখ্যার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে যা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও গ্রামীণ অর্থনীতি সচলতার মূল চালিকা হয়ে দাঁড়ায়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে সকল বণিকেরা ভূপতির পদমর্যাদা লাভ করেননি এবং অর্থনীতি কেবলই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও গ্রামকেন্দ্রিকও হয়ে যায়নি। বহির্বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বেশ কিছু প্রমাণ উক্ত কালপর্বে পাওয়া যায়।[৫৫] কিন্তু সম্ভবত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের হার বহির্বাণিজ্যের তুলনায় অধিক ছিল, এবং তা তুলনামূলকভাবে অধিক সমৃদ্ধশালীও হয়ে ওঠে। এই সময় কতিপয় বণিক তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ লাভে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কেবল মর্যাদার জন্যই নয়, সম্ভবত প্রশাসনিক পদ আহরণের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ক্ষমতায়ণ ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিশ্চয়তা পাওয়া যেত। ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ধর্মপালের ছাব্বিশতম রাজ্যবর্ষে জারিকৃত তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে *মহাসামন্ত* ভদ্রণাগের প্রপিতামহ বলনাগ ছিলেন একজন *সার্থবাহ*।[৫৬] তবে সুজানগর শিলালেখতে বিষয়টির এক চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে: দূরদেশ থেকে আগত *(পারদেশিক)* এক মুসলিম ব্যবসায়ী তথা বণিক গোষ্ঠীর প্রধান *(পঞ্চকুলিক)* হাসির পুত্র অবূদেব একজন *মহাসামন্ত*-এ পরিণত হয়েছেন।[৫৭] *মহাসামন্ত* নিশ্চয়ই বাণিজ্যের জন্য দূরবর্তী অঞ্চলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবেন না। সুতরাং তিনি তাঁর পরিবারের ব্যবসায়িক মুনাফাকে সম্ভবত হাট ও জমি ভোগ, বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠীতে বিনিয়োগ এবং *মহাসামন্ত* পদমর্যাদা লাভেই ব্যয়িত করবেন। সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়া কোনও *পারদেশিক* বণিকের পক্ষে এমন করা সম্ভব হবে না। আর এই সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল বাংলার হাটগুলি।

সূত্র নির্দেশ:

১. Chattopadhyaya, Brajadulal, (1990). *Aspects of Rural Settlements and Rural Society in Early Medieval India*, K P Bagchi & Company, pp. 1-17; নাথ, প্রত্যয়, এবং সেনগুপ্ত, কৌস্তভ মণি, (২০২১), (সম্পা.), *ইতিহাসের বিতর্ক, বিতর্কের ইতিহাস: অতীতের ভারত ও আজকের গবেষণা*, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৮৯-৯৪।

২. Sharma, Ram Sharan, (1965). *Indian Feudalism: c. 300-1200*, University of Calcutta.

৩. Chattopadhyaya, Brajadulal, (1990). *op.cit.,* pp. 1-17.

৪. চৌধুরী, আবদুল মমিন, (২০১৯), (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস: আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত)*, দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃ. ১৫০।

৫. *তদেব*, পৃ. ১৫০।

৬. চৌধুরী, আবদুল মমিন, (২০১৯), (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস: আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত)*, প্রথম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃ. ১-৩০।

৭. Thomas, F. W., (1982). (Ed.). *Epigraphia Indica and Record of The Archaeological Survey*, Vol. XV, 1919-20, The Director General Archaeological Survey of India, pp. 132-134.

৮. Mukherji, Ramaranjan, & Maity, Sachindra Kumar, (1967). *Corpus of Bengal Inscriptions: Bearing on History and Civilization of Bengal*, Firma K. L. Mukhopadhyay, p. 49.

৯. Hultzsch, E., (1897). (Ed.). *Epigraphia Indica and Record of The Archaeological Survey*, Vol. IV, 1896-97, Office of The Superintendent of Government Printing, pp. 243-254.

১০. চৌধুরী, আবদুল মমিন, (২০১৯), *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫১।

১১. Chakravarti, N. P., (1985). (Ed.). *Epigraphia Indica,* Volume XXV, (1939-40), Archaeological Survey of India, pp. 334-335.

১২. চৌধুরী, আবদুল মমিন, (২০১৯), *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫০।

১৩. Gouriswar, Bhattacharya, (2007). The British Museum Stone Inscription of Mahendrapāla, *South Asian Studies* 23, pp. 69-74.

১৪. Furui, Ryosuke, (2020). *Land And Society in Early South Asia: Eastern India 400–1250 AD*, Routledge, p. 156.

১৫. Law, Narendra Nath, (1953). (Ed.). *The Indian Historical Quarterly*, Vol. XXIX, No. 1, pp. 301-302.

১৬. Sircar, D. C., (1987). (Ed.). *Epigraphia Indica*, Volume XXXIII, (1959-60), Archaeological Survey of India, pp. 150-154.

১৭. Chakravarti, N. P., (1938). (Ed.). *Epigraphia Indica and Record of The Archaeological Survey,* Vol. XXII., 1933-34, Manager of Publications, pp. 150-159.

১৮. Furui, Ryosuke, (2011a). Rangpur Copper Plate Inscription of Mahīpāla I, Year 5, *Journal of Ancient Indian History*, Volume XXVII, 2010-11, University of Calcutta, pp. 232-245.

১৯. Furui, Ryosuke, (2013). Merchant groups in early medieval Bengal: with special reference to the Rajbhita stone inscription of the time of Mahīpāla I, Year 33, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 76, pp. 393-399.

২০. *Ibid*., pp. 393-399.

২১. চৌধুরী, আবদুল মমিন, (২০১৯), *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫১।

২২. *তদেব*, পৃ. ১৫১।

২৩. Furui, Ryosuke, (2013). *op.cit.,* pp. 393-399.

২৪. Sircar, D. C., (1973). *Epigraphic Discoveries in East Pakistan*, Sanskrit College, pp. 45-49, 69-75.

২৫. Chattopadhyaya, Brajadulal, (1990). *op.cit.,* p. 27.

২৬. Mukherji, Ramaranjan, & Maity, Sachindra Kumar, (1967). *op.cit.,* pp. 361-370.

২৭. *Ibid*., pp. 363, 366.

২৮. Furui, Ryosuke, (2019). Sujanagar Stone Inscription of the Time of Bhojavarman, Year 7, *Pratna Samiksha: A Journal of Archaeology*, New Series, Volume 10, pp. 115-122.

২৯. চক্রবর্তী, রণবীর, (২০২১), অল্লহভট্টারকস্বামীর উপাসনালয়: দ্বাদশ শতকীয় বঙ্গের অভিজ্ঞতা, *হরপ্পা: বাঙালির বাণিজ্য*, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (অক্টোবর), পৃ. ১৫।

৩০. Chakravarti, N. P., (1931). (Ed.). *Epigraphia Indica and Record of The Archaeological Survey,* Vol. XXI., 1931-32, Manager of Publications, pp. 211-219.

৩১. *Ibid*., p. 214.

৩২. Law, Narendra Nath, (1934). (Ed.). *The Indian Historical Quarterly*, Vol. X, pp. 321-331.

৩৩. Sastri, Hirananda, (1927). (Ed.). *Epigraphia Indica and Record of The Archaeological Survey,* Vol. XIX., 1927-28, Manager, Government of India Central Publication, pp. 277-286.

৩৪. *Ibid*., pp. 282, 286.

৩৫. Watters, Thomas, (1905). (Ed. & Tr.). *On Yuan Chwang's travels in India, 629-645 A.D.*, Vol II, Royal Asiatic Society, pp. 187-188.

৩৬. Sircar, D. C., (1973). *op.cit.*, pp. 30, 66.

৩৭. *Ibid*., pp. 36, 68.

৩৮. Bopearachchi, Osmund, & Ghosh, Suchandra, (2019). (Ed.). *Early Indian History and Beyond: Essays in Honour of B.D. Chattopadhyaya*, Primus Books, pp. 155-174.

৩৯. Sastri, Haraprasad, & Basak, Radhagovinda, (1969). (Ed. & Tr.). *Rāmacaritam of Sandhyākaranandin*, The Asiatic Society, p. 66; Chakravarti, Ranabir, (1986). *Warfare for Wealth: Early Indian Perspective*, Firma KLM Private Limited, pp. 152-153.

৪০. Furui, Ryosuke, (2023). Manahali Copperplate Inscription of Madanapāla, Year 8, *Pratna Samiksha: A Journal of Archaeology*, New Series, Volume 13, pp. 81-96.

৪১. Tawney, C.H., (1880). (Tr.). *The Kathā sarit sāgara or Ocean of the Streams of Story*, Volume 2, The Asiatic Society, 1884, p. 146.

৪২. Furui, Ryosuke, (2011a). *op.cit.*, pp. 232-245; Mukherji, Ramaranjan, & Maity, Sachindra Kumar, (1967). *op.cit.,* pp. 361-370.

৪৩. Gouriswar, Bhattacharya, (2007). *op.cit.*, pp. 69-74.

৪৪. রায়, নীহাররঞ্জন, (১৪০০ ব.), *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ২০০-২২৫।

৪৫. Tripathi, Ratikanta, (1987). *Social and Religious Aspects in Bengal Inscriptions*, Firma KLM Private Limited, pp. 71-97; Hussain, Sahanara, (1968). *Everyday Life in The Pala Empire*, Asiatic Society of Pakistan, pp. 190-191.

৪৬. Furui, Ryosuke, (2013). *op.cit.,* p. 401.

৪৭. *Ibid*., p. 401.

৪৮. Furui, Ryosuke, (2020). *op.cit.,* p. 155.

৪৯. Furui, Ryosuke, (2013). *op.cit.,* pp. 393-399.

৫০. জানা, রঙ্গনকান্তি, (২০১৭), *পশ্চিমবঙ্গের জলযান*, সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, পৃ. ৪-৫।

৫১. Basu Majumdar, Susmita, Chatterjee, Sharmistha, (2014). Cowries in Eastern India: Understanding Their Role as Ritual Objects and Money, *Journal of Bengal Art*, Vol. 19, The International Centre for Study of Bengal Art, pp. 39-56.

৫২. Furui, Ryosuke, (2020). *op.cit.,* p. 195.

৫৩. Furui, Ryosuke, (2013). *op.cit.,* pp. 393-395; Furui, Ryosuke, (2019). *op.cit.*, pp. 116-117.

৫৪. Chattopadhyay, Bhaskar, (1988). (Ed.). *Culture of Bengal through the Ages: Some Aspects*, The University of Burdwan, p. 18; Furui, Ryosuke, (2020). *op.cit.,* pp. 134-135, 138.

৫৫. চৌধুরী, আবদুল মমিন, (২০১৯), *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৪-১৫৮, ১৬১-১৬৬।

৫৬. Furui, Ryosuke, (2011b). Indian Museum Copper Plate Inscription of Dharmapala, Year 26: Tentative Reading and Study, *South Asian Studies*, 27(2), pp. 145-156.

৫৭. Furui, Ryosuke, (2019). *op.cit.*, pp. 115-122.